‘সামষ্টিক অভিপ্রায়’ কি সবার প্রতিনিধিত্ব করে?

কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

গণঅভ্যুত্থান

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে আখ্যায়িত; যেখানে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ একটি কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে একত্র হয়েছিল। এর নেতারা এটিকে সামষ্টিক অভিপ্রায় বা ইচ্ছার বিজয় বলে বর্ণনা করেছেন; যা হবস, লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ধারণা। ব্যক্তিরা সাধারণ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যৌথ চুক্তির ভিত্তিতে সরকার গঠন করে বলে এই দার্শনিকরা কল্পনা করেন। ধারণাটি অনুপ্রেরণামূলক হলেও বহু চিন্তাবিদ এটির কঠোর সমালোচনা করেন। তাদের বক্তব্য, এটি প্রায়ই অসমতা ঢেকে রাখে; ভিন্নমত দমন করে এবং মানব আচরণের জটিলতাকে সরলীকরণ করে।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের জন্য এই সমালোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ, এটি একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়ে তোলার কঠিন পথে যাত্রা শুরু করেছে। অনেকে এই গণঅভ্যুত্থানকে জঁ-জাক রুশোর ‘সাধারণ অভিপ্রায়’ ধারণার একটি আদর্শ উদাহরণ বলে মনে করেন, যেখানে ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে পাশে রেখে সামষ্টিক কল্যাণের জন্য একত্র হয়। ফ্রেডরিখ নিৎশে সামষ্টিক অভিপ্রায় ধারণাটি প্রায়ই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা মতাদর্শের আধিপত্য লুকিয়ে রাখে বলে সতর্ক করেন। বাংলাদেশে শিক্ষার্থী, শহুরে অভিজাত এবং শ্রমজীবী শ্রেণির কিছু অংশ এ গণঅভ্যুত্থানে অত্যন্ত দৃশ্যমান ছিল। গণঅভ্যুত্থানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ভূমিকা রাখলেও তাদের নেতৃত্ব এবং দৃশ্যমানতা সীমিত বলেই মনে হয়েছে। ফলে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে হবে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। একইভাবে তাদের ভূমি অধিকার ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের অভিযোগ নিরসনের ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সংশয় থাকা অমূলক নয়। নিৎশের দৃষ্টিতে, প্রকৃত সামাজিক অগ্রগতি কেবল সামষ্টিক ঐক্য ও সংহতির মধ্যে নয়; বরং ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রীতি-নীতি ও আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার মধ্যে নিহিত।

এখানে কার্ল মার্ক্সের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায়, অনেক রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব, যেমন সামাজিক চুক্তি ধারণা, প্রায়ই ক্ষমতা ও শ্রেণির অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে আড়াল করে।

গণঅভ্যুত্থানে শ্রমজীবী শ্রেণির অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের উপস্থিতি কেবল প্রতীকী ছিল না; এটি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মার্ক্স সতর্ক করেন, এটি শ্রমজীবী শ্রেণির দাবিগুলো পরবর্তী সরকারের অগ্রাধিকারে থাকার নিশ্চয়তা দেয় না। ইতিহাসেও এর উদাহরণ কম নয়।

পোশাক শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবি জানিয়ে আসছে। এ দাবিগুলো কি এবার পূরণ হবে? মার্ক্সের বিশ্লেষণ বলে, কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া, যারা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল, তারা একই শোষণমূলক ব্যবস্থায় বন্দি হয়ে থাকতে পারে।

ডেভিড হিউম সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের মূল ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁর মতে, ইচ্ছাকৃত চুক্তি বা সম্মতির ধারণা একটি বিমূর্ত এবং কল্পনাপ্রসূত কাঠামো; যা সরকার কীভাবে গঠিত হয়, তার বাস্তবতার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। হিউম মনে করেন, সরকার যুক্তিসংগত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক চুক্তির মাধ্যমে নয়; বরং ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম, ক্ষমতার লড়াই এবং প্রথার ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে যে এটি সত্যিই সব নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা? পূর্ববর্তী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আন্দোলনে নাগরিকদের একতাবদ্ধ করলেও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তারিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনা এতে অনুপস্থিত ছিল। হিউমের সমালোচনা তুলে ধরে যে নতুন নেতৃত্ব যদি বাদ পড়া গোষ্ঠীগুলোর উদ্বেগের কার্যকর সমাধান করে সমর্থন অর্জন করতে না পারে, তবে বৈধতার প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ বৈধতা কাল্পনিক চুক্তির চেয়ে বাস্তব উপযোগিতা এবং জনসমর্থনের ওপর বেশি নির্ভর করে।

এ ক্ষেত্রে মিশেল ফুকোর ক্ষমতা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা দেয়। ফুকোর মতে, ক্ষমতাকে সহজেই একীভূত বা হস্তান্তর করা যায় না; এটি সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান এবং নিয়মের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং কার্যকর হয়। একটি নতুন সরকারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সামষ্টিক অভিপ্রায় ধারণার ব্যবহার কর্তৃত্ব সংহত এবং ভিন্নমত দমন করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিশোধ এবং পাল্টা প্রতিশোধের চক্রে আবদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস প্রায়ই এটিকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনের চেষ্টা করলে নতুন সরকার সেই অন্যায়গুলোকেই ফের প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি তৈরি করবে, যা দূর করার জন্য গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এতে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ভাঙার পরিবর্তে আরও দৃঢ় হতে পারে।

হবস, লক ও রুশোর মতো চিন্তাবিদরা বিশ্বাস করেন, মানুষ ব্যক্তিগত আবেগকে দূরে সরিয়ে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আবার এডমান্ড বার্ক মনে করেন, মানব আচরণ প্রায়ই বিশুদ্ধ যুক্তির চেয়ে আবেগ, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায়ই তাৎক্ষণিক ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত হয়; যা গভীর চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনার চেয়ে আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান সফলভাবে নিপীড়ক সরকারকে অপসারণ করতে পারলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং পরিবেশ সংকটের মতো জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বিস্তারিত রোডম্যাপ দিতে এখনও সক্ষম হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

এ সমালোচনাগুলোকে অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক মনে হলেও এগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থেই বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। সফল হতে চাইলে নতুন সরকারকে অবশ্যই বৈধতার জন্য সামষ্টিক অভিপ্রায় ধারণার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে এমন নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যা কেবল আন্দোলনে সবচেয়ে দৃশ্যমান গোষ্ঠীগুলোরই নয়, বরং সব নাগরিকের প্রয়োজনকে সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত করবে। শ্রমিকদের মজুরি এবং কর্মপরিবেশের বাস্তব উন্নতি করতে হবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অভিযোগগুলো আমলে নিতে হবে। জাতীয় রাজনীতিতে উপেক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ওপরে গুরুত্ব দিতে হবে।

এ ছাড়া সরকার যেন সামষ্টিক অভিপ্রায় ধারণাটিকে ক্ষমতা সংহতকরণ বা ভিন্নমত দমন করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে, তা নিশ্চিত করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা সমাজের সব অংশের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে অতীতে ক্ষমতার পালাবদলে প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধের যে চক্র দেখা গেছে, তা ভাঙতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধী সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক নীতি এড়ানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান যদি সত্যিই সফল হতে চায়, তবে এর নেতাদের স্লোগান এবং বিমূর্ততার বাইরে গিয়ে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে; যা সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং সব বাংলাদেশির প্রয়োজনের প্রতি জবাবদিহিমূলক। তাদের ব্যর্থতায় আন্দোলনটি আরেকটি ক্ষণস্থায়ী আশায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে; যা জনসমাজে নিতান্তই আরেকটি অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং আরও গভীর বিভাজনের চিহ্ন রেখে যাবে।

■ ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা: সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়